ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1052-1059
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.104

উনিশ শতকের কলকাতার শহুরে বাবুদের গণিকাযাপন: যৌনতার নানা রূপ

ড. দোয়েল দে, *সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 19thcentury Bengal, 'babu culture', characterized by the newly educated and wealthy Bengali elite, saw a rise in the association of drinking and visiting brothels, with prostitution becoming a prominent aspect of their social lives. The economic changes brought about by colonial rule, including the decline of traditional industries and the rise of a new landed gentry, contributed to the growth of prostitution in Calcutta (now Kolkata). The newly educated and wealthy Bengali elite, known as "babus," often frequented brothels and engaged in drinking as a form of leisure and social activity. Brothels became spaces where "babus" could indulge in drinking and sexual pleasure, and this became a prominent feature of their culture. There were two classes of prostitutes: professional entertainers and those who were essentially sex slaves, highlighting the social hierarchy of the time. Colonial administration often enjoyedthese types of entertainments in several social festivals. For some "babus," keeping a prostitute was seen as a status symbol, and some even built elaborate houses for them. Thus 19th century Babu culture of Calcutta represented a typical socio moral degradation.

Key Words: *19th century, Calcutta, Babu Culture, Prostitutes, British.*

যৌনতা একটা বিরাট সামাজিক শক্তি। সমাজে তা বরাবরই ধর্মের সুতোয় বাঁধা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে এর ভূরিভূরি উদাহরণ আছে। পুরাণ পড়লে বোঝা যায়, বহুগামিতা, বহুকামিতা, সমকামিতা, পশুকামিতা— সবরকম যৌনতার কথাই সেখানে আছে '*গীতা*', '*রামায়ণ*', '*মহাভারত*', বড়ুচণ্ডীদাসের '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*', ভারতচন্দ্রের'*বিদ্যাসুন্দর*' ইত্যাদিতে এর বহু উদাহরণ আছে। প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগ থেকে পনেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত লেখা হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থ যার মূল উপজীব্য বিষয় হলো যৌনতা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দ্বাদশ শতকে লেখা 'কোক্কের রতিরহস্য', যা সাধারণভাবে 'কোকশাস্ত্র' নামে প্রচলিত। এই বইটি অনুসরণ করে ষোলো শতকে কল্যাণমল্ল লেখেন, 'অনঙ্গরঙ্গ'। কোনও কোনও আলোচক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় 'কোকশাস্ত্রে'র প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। এই কাব্য রাধাকৃষ্ণের আবেগময় রতি কাহিনির এক ধ্রুপদী নিদর্শন। সতেরো শতকে লেখা দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' (১৬৫৯) কাব্যেও রয়েছে নারী-পুরুষের রতিমিলনের উন্মুক্ত বর্ণনা। সহজযানী বৌদ্ধ ধর্মেও সিদ্ধাচার্যরা দেহকেই সাধনার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বে নর-নারীর শরীর এবং দেহমিলনের মধ্য দিয়ে পরমার্থ লাভের ধারণাটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতে, সম্ভোগের অভিজ্ঞতা বিনা প্রকৃত 'রসিক' হওয়া যায় না। 'মিশেলফুকো' এবং তাঁর তিন খণ্ডে লেখা- '*দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি*' বইটিকে যৌনতার এক প্রামাণ্য আখ্যান বলা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজকে বিশ্লেষণ করে ফুকো

দেখিয়েছেন, পেগান এবং প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগে বেশ কিছু যৌন নিয়ন্ত্রণের ধারণা গড়ে উঠলেও, সেগুলি আধুনিক যুগের থেকে আলাদা এক জটিল নৈতিকতার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যৌনসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যক্তির সম্মানিত নাগরিক হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত। ফুকোর মতে, গ্রিকরা মনে করত, খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি মানুষের যেমন স্বাভাবিক আসক্তি দেখা যায়, তেমনই যৌনতার প্রতিও মানুষের তীব্র আসক্তি মানবচরিত্রের পশুত্বের দিকটিকেই প্রকট করে।

উনিশ শতকের কলকাতার মূল সংস্কৃতিই ছিল বাবু সংস্কৃতি। বাবুরা বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে কলকাতায় এসে আমোদ ফুর্তি করতেন, তাদের কয়েকজন মোসাহেবও জুটে যেত।বাবুরা এদের হাতের পুতুল হয়ে সব টাকা খুইয়ে ফেলতেন। তারপর নিজের জমিদারিতে গিয়ে খাজনা আদায় করে আবার কলকাতার পথ ধরতেন। কেউ কেউ আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে কলকাতায় স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন। বাবু সংস্কৃতি যে কলকাতায় বিপুল বিস্তারী প্রভাব ফেলেছিল সে কথা বলা চলে নিঃসন্দেহে।

মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকূল্যে উনিশ শতক বাঙালি সমাজের সার্বিক উত্থানের কাল হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এর পাশাপাশি সমাজ-অভ্যন্তরে অনাচারের একটি চোরা-স্রোতও বহমান ছিল। ভুঁইফোঁড় নব্যধনী এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যেও চারিত্রিক ভ্রষ্টাচার দেখা দেয়। এমনকি সমাজের নেতৃস্থানীয় খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউও এই নৈতিক স্খলন থেকে মুক্ত ছিলেন না। সুরাপান, বেশ্যাসক্তি ও রক্ষিতা-পোষণ সেকালে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণিকাচর্চা গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।

উনিশ শতকের কলকাতার বাবু সংস্কৃতি

কলকাতার বাবু সংস্কৃতির মূলে ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর আর তারও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন।বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে সিরাজের বিরুদ্ধে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ইংরেজরা ক্ষমতা লাভ করেই তাঁদের প্রণীতশাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের প্রচলিত কাঠামোটা ভেঙে পড়ল। অস্তিত্ব রক্ষায় গ্রামের মানুষজন একে একে গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার আসতে শুরু করলে কলকাতা শহর হয়ে উঠল এই সব ছিন্নমূল মানুষের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংরেজদের দ্বারা কলকাতা নগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাতারাতি কলকাতার গুরুত্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ, কলকাতা শহরে প্রথমে যে ইংরেজরা এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অস্তগামী মধ্যযুগের উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধি। নতুন শিক্ষা বা নতুন সভ্যতার অগ্রদূত তাঁরা ছিল না। তাঁরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হত, হিন্দুদের পুজোপার্বণে অংশগ্রহণ করত, তৎসহ হিন্দুদের মতোই তুকতাকে বিশ্বাস করত। উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধিদের পিছন পিছন চুল পরিচর্যাকর, বাজিকর ইংরেজরাও এসেছিল। বাংলার জমিদারদের মতো খানাপিনা ও জীবন-যাপন করাটাকেই তখন ইংরেজরা আভিজাত্য মনে করত।

এই প্রকৃতির ইংরেজদের স্পর্শ পেয়ে আবির্ভাব হল এক নব্য ধনী সম্প্রদায়ের। এই নব্য ধনী সম্প্রদায়ই 'বাবু সম্প্রদায়' নাম পরিচিত হলেন। এঁরাই রাজা, মহারাজা উপাধি নিয়ে জুড়ি গাড়ি, প্রাসাদোপমবাড়ি, মোসাহেব আর দাসদাসীদের নিয়ে কলকাতা শহরে জাঁকিয়ে বসেন। কলকাতার এই 'বাবু'দের সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি ছিল টাকা। সেই টাকার প্রাপ্তি ঘটেছে ইংরেজদের লুণ্ঠনসহযোগী রূপে। এইভাবেই তারা সারাবাংলার রক্ত শোষণ করে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল প্রাচুর্যের পাহাড়। এদের পরিচয় ছিল ইংরেজদের দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, কেরানী প্রভৃতি শত নামেইংরেজরা তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতো 'Black Zamindar'।

হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই ধনিক এবং নতুন জমিদাররাই কলকাতার বসবাস করে 'বাবু' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেন। গণিকাবিলাস সহ বিভিন্ন আমোদপ্রমোদই এই বাবুকুলের একমাত্র আরাধ্য ছিল। নানারকম পুজো উপলক্ষে বা কোনোরকম উপলক্ষ ছাড়াই নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, বুলবুলির লড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগানেরআয়োজনে এই বাবুরা থাকত সদাব্যস্ত। কার আয়োজন সব থেকে জমকালো হল, তা নিয়ে রীতিমতো অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। জলের মতো অর্থ ব্যয় হত। ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হত। ইংরেজরা বাবুদের তারিফ করত।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ধনী ও জমিদারদের উপাধি দিত। এই উপাধির লোভে নব্য ধনীরা উৎসবের আয়োজনে বহুগুণ বৃদ্ধি করত।

বাবু হতে গেলে কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করা, চার ঘোড়ারগাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান করতে যাওয়া, দু-একটি রাঁড় রাখা, রক্ষিতাদের দালানকোঠা করে দেওয়া, পায়রা ওড়ানো, বিদ্যাসুন্দরের আসর বসানো, শনিবারের রাতে বাই-বেশ্যা নিয়ে আসর বসানো ইত্যাদি করতে হয়। বহু বাবু পাল্লা দিয়ে লোক দেখানো এসব করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মোট কথা—বাবু শুধু ভোগ করতে চান না, খ্যাতি চান, সকলের সঙ্গে টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা করে সবার উপরে থাকতে চান। কলকাতার বিখ্যাত আট বাবু ছিলেন এর মধ্যে অগ্রগণ্য। কলকাতার আট বাবুর মধ্যে ছিলেন নীলমণি হালদার, রামতনু দত্ত, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতু সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় রায় এবং চোরাবাগান মিত্র বংশের এক বাবু—এঁরাই ছিলেন আট বাবু। পরবর্তীকালে নামডাক সম্পন্ন আরও বাবু এসেছিলেন, কিন্তু উপরে উল্লিখিত আটবাবুই হলেন কলকাতার প্রথম বাবু। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–

> "যিনি উৎসবার্থদুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু।"[১]

ডক্টর অসিতকুমারবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'বাবুর উপাখ্যান' বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ আখ্যানগুলি অর্ধশিক্ষিত ধনী সন্তানদের কুৎসিত আমোদ প্রমোদের কথা সাধুভাষায় বলা হলেও উদ্দেশ্যটি তত সাধু ছিল না। বাইরের দিক থেকে এসব নকশায় রঙ্গকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গল্পের আমেজ থাকলেও ভিতরে ছিল 'পর্নো' (porno), কেচ্ছা-কেলেংকারি। সমাজের কুরীতি দেখি যে সভ্য ভব্য মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভবানীচরণ ও অন্যান্য নকশাকারেরা কলম ধরেছিলেন।

বাবুদের গণিকাযাপন

এই বাবুদের অন্যতম এক নেশা ছিল গণিকালয় গমন। বস্তুতঃ তাদের একটি রাতও রক্ষিতা ছাড়া রঙিন হতো না। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের সামাজিক পদ মর্যাদা অনেকাংশেই নির্ভর করতো তাদের রক্ষিতা পোষার উপর। সমকালীন কলকাতার একজনও এমন বাবু ছিলেন না যাদের এক বা একাধিক রক্ষিতা থাকতো না। ফলে তারা এক বল্গাহীন যৌন জীবন যাপন করতো। এক কথায় নারী এবং সুরা এ দুটিই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভুলে গেলে চলবে না কলকাতার বাবু সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল- বাঈজি বা গণিকাকে নিজের করায়ত্ত্ব করে নেওয়া। তবে যাকে তাকে নয়, সবচেয়ে খ্যাতিমান বাঈজিকে অন্য কারো কাছ থেকে তুলে আনার মধ্যে ছিল সেরা বাবু হওয়ার পথ। হঠাৎ কোনো বাইজী বা গণিকার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে 'বাঁধা মেয়েমানুষ' হিসাবে রাখার জন্যে বাবুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। এই গণিকাচর্চাই ছিল বাবু কালচারের অঙ্গ। কালীপ্রসন্নের লেখা থেকে জানা যায়, রাজরাজড়ারা রাতে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখতেন না। প্রতিরাতই তাদের কাটতো কোনো না কোনো গণিকার গৃহে। শুধু তাই নয় তৎকালে বিদেশে স্ত্রী-পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রথা না-থাকায় প্রায় সকল আমলা-আইনজীবী ও মোক্তারদের এক একটি উপপত্নীর দরকার হত। অতএব এই 'উপপত্নী'র যোগান যাতে নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে, সেই কারণে তাঁদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় প্রতিষ্ঠা পেতে থাকল। সেজন্যই উত্তর কলকাতার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত শহরবাসীদের বসতি কেন্দ্রের আশেপাশেই শহরের বিখ্যাত গণিকালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বাবুদের মেয়ে মানুষ নিয়ে আমোদ করার জন্য যেমন, তেমন সাধারণের জন্যও শহরে গড়ে উঠেছিল নতুন তীর্থক্ষেত্র, গণিকালয়। সুতরাং এমন পাড়া ছিল না যেখানে অন্তত দশঘর গণিকা নেই। শহরে তখন যত্রতত্র এদের বসবাস। গৃহস্থের বাড়ির পাশে, সদর রাস্তার উপর, যেখানে ইচ্ছা গণিকারা বাস করত। এমনকি জোড়াসাঁকোর মূল ব্রাহ্মসমাজটি গণিকালয়ের মাঝখানেই। হুতোম প্যাঁচার নকশার মন্তব্যে কলকাতা শহর তখন 'বেশ্যাশহর' হয়ে পড়েছে। প্রতিবছর গণিকার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। গণিকারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি আর গালিগালাজ করত। সাধারণ পথিকরাও তাদের হাত থেকে নিস্তার পেত না। কখনো দেখা গেল এক গণিকা রসিকবাবুকে দেখে পানের পিক ফেলতে গিয়ে তা অফিস ফেরত এক কেরানিরমাথায়পড়ল। কিন্তু কেরানিটিভয়ে কিছু না-বলে মানসম্মান নিয়ে চলে গেল।

কলকাতায় গণিকাদের পসরা এতটাই বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছিল যে দেখা যায়, গৃহস্থের বাড়ির পাশে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, চিকিৎসক কবিরাজ বাসস্থানের পাশে বেশ্যা, এমনকি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আষ্টেপৃষ্ঠে বেশ্যা। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার খবরে জানা যায়-

> "গণিকারা প্রত্যহ সন্ধ্যা হতে রাত দশটা পর্যন্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে যে-সব কুভাষা বা কদর্যালাপ করত, তাতে সাধারণ পথিকরা বিব্রত হতেন। স্বভাবতই পথিকদের দেখলে গণিকারা আমন্ত্রণ জানাত, পথিকদের নানা ভাবেউৎপাত করত, এমনি পথিকদের উদ্দেশে নানারকম কুকথাও বলত।"[২]

কলকাতার পুলিশ ধনীদের আশ্রিত প্রমোদপল্লী এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেত না। স্থানীয় বর্ধিষ্ণু সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নীতিবোধ ও রুচিবোধ গণিকাদের এই প্রকাশ্য ইতরামিতে ক্ষুণ্ণ হত এবং তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করত। কিন্তু তাতে ফল কিছুই পাওয়া যেত না। স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার একটি এলাকাতেই ৪৩টি গণিকালয়ের মালিক ছিলেন। বিত্তশালী বাবুদের প্রশ্রয়েই এইসব গণিকাপল্লী গজিয়ে উঠেছিল। অতএব প্রশাসনের সাধ্য ছিল না এহেন কালচারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার। এইসব বাবুদের আদর্শ ছিল মূলত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। শ্রীপান্থ লিখেছেন—

> "সতীদাহ কলকাতায় তখন প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। সারা ব্ল্যাক টাউন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলছে বাবুবিলাস, গুরু-প্রসাদী কৌলীন্য রক্ষা। সতীর আর্তনাদে, বিধবার কান্না আর বারবনিতার কাতর আহ্বানে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা প্রেতপুরী। পা যেন লজ্জায় জড়িয়ে আসে সেদিকে বাড়াতে।"[৩]

সন্ধ্যা হলেই নগর কলকাতাকে নাগর-কলকাতা বলে মনে হত। 'তত্ত্ববেধিনী' পত্রিকায় বলা হয়েছে,

> "সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত। কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, ...কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে।"[৪]

গণিকালয় যে শুধু সাহেব আর বাবুদের জন্য গড়ে উঠেছিল ব্যাপারটা এমন নয়। চোর-ডাকাত, বদমাস এবং ইতরজনরাও এসব গণিকাদের কাছে যৌনক্ষুধা মেটাতে যেত। তাই বলে সব গণিকালয় একরকম ছিল না। মানুষভেদে, শ্রেণিভেদে নানা ধরনের গণিকালয় গড়ে উঠেছিল সেসময়। সন্দেহ নেই এই গণিকালয়গুলো কলকাতা শহরের এক বৈচিত্র্য ছিল এবং বিভিন্ন গণিকালয়ে বিভিন্ন ধরনের রঙ্গ চলত। মধ্য রাতে শহরের রাস্তায় সজ্জিতভাবে বহু গণিকাকে খদ্দেরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। ভদ্রলোক বাবুরা তখন নিজেদের ঘরের স্ত্রী-কন্যাদের পর্দানসীন করে ফেলেছিলেন, আর নিজেরা ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাগান বাড়িতে বসে সেরা গণিকাদের হাট বসাতেন। বাবুরা তখন তিন 'ম'-তে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন—মদ, মাংস ও মেয়েমানুষ। গণিকাচর্চা সেকালের অনেক বিত্তবান বাঙালির কালচারে পরিণত হয়েছিল।

বাঈজী কালচার এবং সেকালের কলকাতার 'বাবু' সম্প্রদায়

উনিশ শতকের কলকাতা বল্গাহীন যৌনাচারের অপর একটি ডেকে হলো বাঈজী সংস্কৃতি। নাচে গানে পটু গণিকাদের একটা সম্মানীয় নাম ছিল—বাঈজী। সাধারণ গণিকাদের থেকে এদের কদর এবং মূল্য বরাবরই একটু বেশি হতো। কারণ যৌন সুখের পাশাপাশি এরা নাচ গানেও এদের বাবুদের আমোদ প্রমোদ দিতো। ওই সুন্দরী বাঈজীদের বাবু ও জমিদারেরা ভাড়া করে আনতেন। নাচ, গান, বাজনা আর খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আরও কুৎসিত আমোদ প্রমোদের উৎসব চলতো ঢালাও ভাবে। এই ছিল কলকাতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজ সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়িতে এসব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলত। নিকী ছিলেন সেকালের এক নামকরা বাঈজী। নিকী ছাড়াও আশরুন, ফৈয়াজবক্স, বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান, জিন্নাত প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত বাঈজীদের নিয়ে এসে নাচগানের ব্যবস্থা করা হত। এই সমস্ত বাঈজীরা তখন শোভা বাজার, চোরাবাগান, বটতলা, মাণিকতলা

এককথায় সারা কলকাতা মাতিয়ে রেখেছিল। নিকীবাঈজীকে নিয়ে সেকালের কলকাতার বাবুরা নিজেদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে দরকষাকষি করতেন। ফলে নিকীর বাজারদর হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া। শেষ পর্যন্ত নিকী বাঈজীকে কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি মাসিক এক হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে রক্ষিতা রূপে গ্রহণ করে সমাজে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[৫] অর্থাৎ সেই সময়ে বাবুদের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিও ছিল গণিকা বা বাঈজীরা যাপন।

এইভাবে বাবুদের দরকষাকষির ফলে বহু বাঈজী তাঁদের রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হতো। বাবুরা সারারাত বাঈজী নিয়ে পড়ে থাকতেন বাগানবাড়িতে। বসতবাড়ির চাইতে বাগানবাড়ি আর পত্নীর চাইতে উপপত্নী ছিল বাবুদের কাছে বেশি প্রিয়। অনেক সময় উপপত্নীর গর্ভে বাবুদের ঔরসজাত সন্তানও জন্ম নিতো। তবে সেসব সন্তান সামাজিক বা আইনী স্বীকৃতি পেতো না। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বাঈজীদের আনার জন্য পাল্কী পাঠিয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে যেত পাইক ও বরকন্দাজ। পাল্কীটাকে বেহারারা নাটমন্দিরের সামনে এনে নামাত।

> "রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন খুশী উজ্জ্বল দুটো কামাতুর চোখ নিয়ে। মোসাহেবের দল অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে পাল্কীর রুদ্ধ দুয়ারের দিকে তাকাতেন। তারপর দরজা দুটো খুলে যেত। নর্তকী নামত, পরনে মসলিনের পেটিকোট ও ওড়না ও সমস্ত দেহ অলঙ্কারে মোড়া, ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ঠিকরে পড়ত। রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন, বলতেন, এস বিবিজান।"[৬]

দুর্গাপুজো ছিল বাবুদের সবচেয়ে জমকালো উৎসব। সাহেবরাও এই উৎসবে যোগদান করার জন্য সবসময়ই আমন্ত্রিত হতেন।

> "They all observed the Doorgah festival and given their guests an excellent meal (?), for they feasted upon wines and liquors of all kinds, and had enough of eatables."[৭]

দুর্গাপুজোয় দু'হাতে পয়সা খরচ করে জাঁকজমক আমোদ প্রমোদের প্রতিযোগিতায় নামতেন সেকালের নাম করা ধনীরা। কে কত বড় বাঈজি আনতে পারে, আলোর রোশনাই দেখাতে পারে, মদের বন্যা বওয়াতে পারে, দেশি ও বিদেশি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি আনতে পারে তার প্রতিযোগিতায় টেক্কা দেওয়াই ছিল এদের একমাত্র লক্ষ্য। এমনি ঝুটো সম্মান জ্ঞানের জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল।[৮]

দুর্গাপুজোর এই প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন,

> "যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।...নিজ ভবনে বাঈজী দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমনকি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৯]

বস্তুতঃ নবাবী-আমল শেষ হলেও নবাবী সংস্কৃতির অবলুপ্তি তখনও ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের নবাবী-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। ঊনিশ শতকের বাবু সংস্কৃতিতে

> "দেওয়ানি ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়িতে যেমন, তাদের কৃপাশিত বাঙ্গালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজে চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে।"[১০]

মহারাজ সুখময়রায়ের বাড়ির ১৭৯২ সালের দুর্গাপূজা আর বাঈজী নাচের বিবরণ 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'-এ প্রকাশিত হয়,

> "The only novelty that rendered the entertainment different from those of lost year, was the introduction or rather the attempt to introduce some English tunes among the Hindusthani Music."[১১]

রাজেন্দ্র মল্লিকের কান-ফোঁড়া উপলক্ষে যে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবানুষ্ঠান হয়েছিল, তার বিবরণ ১৮২৩-র ১৫ মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,

> "...চারিদিকে সুবর্ণ খচিত ফুলের মালা ও ফুলে সুসজ্জিত, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যে যেন স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়। নর্তকী গায়িকার সংখ্যা অধিক না হইলেও যে দুইজন নাচিতেছিল তাহারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী। নিকীর গান ও রূপের বর্ণনা তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে মানাইয়াছিল। গোলাপের সহিত পদ্মের বর্ণ যেন মিশ্রিত হইয়া অনুপম কপোলে উজ্জ্বলাভা বিকীর্ণ করিতেছে, চক্ষু হইতে আনন্দ উৎস বিচ্ছুরিত হইতেছে, অন্যটিকে ইউরোপের বিনপক্ষীর মত সুন্দর মনে হয়, তাহারা যেন কন্দর্পের শর লইয়া ক্রীড়া কন্দুক করিতেছিল।...সুনির্বাচিত সম্মিলনীতে সুমিষ্ট সুরা লেহ্যপেয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সহিত নৃত্যাদিতে যথারীতি আদর আপ্যায়নে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট, কিছুরই ত্রুটি ছিল না।"[১২]

এদের উৎসবানন্দের জলসায় দেশীয় ধনিক ও কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতেন। এদের বল্গাহীন আমোদ প্রমোদের একটি সংযত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পার্ক। তিনি সে সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন এবং একজন ধনিক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী'র উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার বিবরণে জানা যায়,

> "...পাশের একটি বড় ঘরে নানারকমের উপাদানে উপাদেয় সব খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক 'মেসার্স গাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও মদ্যও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাঈজীদের নাচগান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।"[১৩]

এক বাঈনাচের খবর বেরিয়েছিল 'এশিয়াটিকজার্নাল'-এ। এতে লেখা হয়েছিল,

> "We had an opportunity on Monday evening of discovering in which particular house, the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view, we fear that the chief singer Nikkee and Ashroon, who are engaged by Neel MunneeMullick and Raja Ramchunder, are still without rivals in melody and grace. A woman named Zeenut who belongs to Banaras, performs at the house of BuderNathBaboo, in Jorasanko. Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Parsad Bhos."[১৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, এইসব রাজা-রাজড়ারা আর ছিলেন না কিন্তু ঐসব বাঈজী নর্তকী ও তাদের বংশধরেরা তখনও কলকাতায় আসর জমিয়ে বসে ছিলেন। দুর্গাচরণ রায়ের *দেবগণের মর্তে আগমন* (১৮৮৯) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তখনকার দিনের 'বাঈওয়ালির মধ্যে ইলাহিজান...বিখ্যাত'। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে—

> "খেমটাওয়ালিদের মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।"[১৫]

পৃথকীকরণের চেষ্টাটা লক্ষণীয়। পুজোয় এবং বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও ধনীগৃহে এ শতাব্দীর শুরুতেও এঁদের বায়না দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। যদিও ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা খেমটার সঙ্গে সঙ্গে বাঈ নাচেরও বিরোধিতা করতেন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির অধিকাংশের কাছেই বাঈজী নাচ তার বনেদি, রাজদরবার-সম্পর্কিত উৎসের জন্য পার পেয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' ও 'মধ্যস্থ'-র মতো নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্রের চোখে বাঈজী নাচ শুধু রুচিসম্মত বলেই বিবেচিত হয়নি, 'পৌরাণিক গাম্ভীর্যের পরিচায়ক' বলেও সম্মানিত হয়েছে।

গওহরজান ছিলেন সেই সময়ের আর এক নামকরা বাঈজী। তার জন্ম ১৮৭৩ সালে। গওহরের আসল নাম এঞ্জেলিনা, বাবার নাম রবার্ট উইলিয়াম, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাশীতে ছিল তাঁর বাসস্থান। মায়ের নাম ভিক্টোরিয়া হেমিংস। ভিক্টোরিয়া ছিলেন অসাধারণ রূপসী। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নতুন তার নাম হয়মালকাজান। এসময় সে মেয়ের নামও পাল্টে দিল—এঞ্জেলিনা হল গওহরজান, সংক্ষেপে গহর। বস্তুতঃ মুজরোয় নেশার ঘোরলাগিয়ে দেবার মন্ত্র মালকাজানের হাতের মুঠোয় ছিল। এবং সেই বিদ্যা গোপন রাখেননি আদরের মেয়ে

গহরজানের কাছে। বিদ্যেধরীদের ছলাকলায় সবটুকু বিদ্যে উজাড় করে শিখিয়ে ছিলেন মেয়েকে। এর জোরেই গহর বয়সকালে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। হিন্দুস্থানের সেরা বাঈজীরা ছিল তার প্রতিযোগী। মায়েরা রঙ রূপটুকুর সঙ্গে পেয়েছিলেন নিষ্পাপ মুখশ্রী। অদ্ভুত লাবণ্যময়ী ছিলেন গহরজান। নাচগান শিখতে কোনদিন পরিশ্রমের পরোয়া করেননি। জীবনে যখন যেখানে ভাল গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন, উঠে পড়ে লেগে অল্পদিনেই শিক্ষা শেষ করেছিলেন। পরে যখন জীবিত অবস্থাতেই প্রায় কিংবদন্তীর মত অবস্থা তার, সে সময়ও শেখার বিরাম ছিল না। গওহরজানকে বলা হত 'Indian Nightingale'। তার দক্ষিণা ছিল ১৫০০ টাকা। জানা যায়, ১৯০২ সালে পাটনায় একটা বিয়ে বাড়ির আসরে গওহরজান একখানা স্বরচিত গজল গেয়ে সবাইকে মোহিত করে দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে গওহর মারা যায়। গওহরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয় ১৯৩০ সালের ১৮ জানুয়ারি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। এতে লেখা হয়েছিল,

> "A loss has been sustained by the death in Mysore of Madame Gauhar Jan, where she was Court singer and dansense to H. H. the Maharaja of Mysore."[১৬]

এই কাগজে আরও লেখা হয়,

> "Her fame as a songstress earned her the title of 'Indian Nightingle' and when gramophone records were first made of Indian songs, she was the first to be approched."[১৭]

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের বিকাশমান শহর কলকাতায় নানা ধরণের মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। সুযোগসন্ধানী যারা, তারা দেওয়ানী বা মুৎসুদ্দিগিরি কর্ম করে বেশ দু'পয়সাও করে নিল। নিয়ে অভিজাত পংক্তিভুক্ত হবার জন্য গ্রামে-গঞ্জে জমিদারি কিনল এবং শহরে এসে সেই জমিদারির লাভের বখরা নিয়ে তারা একদিন হঠাৎ কাড়িকাড়ি টাকার মালিক হয়ে উঠল। সমাজে তারা 'বাবু' নামে স্বীকৃতিও পেল। এই শ্রেণিভুক্ত সবাই কিন্তু টাকার পেছনে ছুটেননি, অনেকে অবসর সময়ে সমকালীন সমাজধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করছিলেন, এবং তাদের এই চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতায় এক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বাঙালির জীবনে এই নবজাগরণ যে কিছু পরিমাণে যুক্তিবাদ নিয়ে এল, তাতে এ যুগের মানুষদের একটা অংশ ('নববাবু'রা) হয়ে উঠল অনেকটা ইহমুখী। একান্ত অদৃষ্ট নির্ভরতা ছিল যার স্বভাবধর্ম, এই সময় থেকে সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই তৈরি করতে চাইল, সহায়ক হল সমকালের পরিবেশ। নবকৃষ্ণ, গঙ্গা গোবিন্দ, গোবিন্দরাম, গোপীমোহন, রামদুলালরা হঠাৎ যেন ধনকুবেরের সেই ধন হাতে পেলেন। এই ইহমুখিনতাই হঠাৎ-বড়োলোকদের প্রাণিত করেছিল প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিতে। ভোগেই জীবনের সার্থকতা—এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যেমন দুর্গোৎসব), বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে তাদের এই ভোগবাদী জীবনের চিত্রটা ফুটে উঠত। কলকাতার এই 'নববাবু'দের ভোগবাদী তথা উশৃঙ্খল জীবনের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছিল সেকালের গণিকা তথা বাঈজীরা। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের এই গণিকা যাপন ছিল তাদের বিলাস বৈভবের পৌরুষ আস্ফালন, কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, সমকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে কলুষিত করে তুলেছিল বাবুদের এই গণিকা প্রীতি। বাঈজীদের নাচ গানের দ্যুতির আড়ালে বাবুদের যথেচ্ছ যৌনাচার ও লাম্পট্যের কথা সমকালীন কলকাতার আকাশে বাতাসে কান পাতলেই শোনা যেত, যা শুধু সমকালেই নয় বর্তমান কালের অন্যতম এক আলোচ্য বিষয়। যৌনতার সেকাল ও একালের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কলকাতার বাবুদের গণিকা যাপনের ইতিবৃত্ত এক অন্যতম আলোচিত বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, লোকরহস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮৭৪, পৃ. ২১-২৩
২. ঘোষ, বিনয় (১৯৭৮), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, প্যাপিরাস, কলকাতা, , পৃ. ৭৩
৩. শ্রীপান্থ, শ্রীপান্থের কলকাতা, ত্রিবেনী প্রকাশন প্রা. লি. ১৯৬১, পৃ. ২১৩
৪. *তত্ত্ববেধিনী পত্রিকা*, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শকাব্দ, ১৮৪৬ খ্রীঃ, ৩৬ সংখ্যা।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১২১

৬. সুর, অতুল (১৯৮৩), *কলকাতার চালচিত্র*, কলকাতা, পৃ. ১৯৩।
৭. *The India Gazette*, 22 October 1831
৮. জোয়ারদারবিধানাথ (২০১১), *অন্য কলকাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৯৯-১০১।
৯. শাস্ত্রী,ক শিবনাথ (১৯৫৭), *আত্মচরিত*, কলকাতা, , পৃ. ৫৫-৫৬।
১০. ঘোষ, বিনয় (১৯৮৪), *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, ওরিয়েন্টলংম্যান, কলকাতা,পৃ. ২৫
১১. *ক্যালকাটাক্রনিকল*,২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯২।
১২. মল্লি:্ প্রমথনাথ (১৯৩৫), *কলকাতার কথা*, মধ্যকাণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৪৩-৪৪
১৩. ParkesFanny (1850), *Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque, during twenty-four years in the East; with revelations of life in the zenana*, London; ঘোষ বিনয় (১৯৬১), *সুতানুটি সমাচার*, কলকাতা, পৃ. ৩৪২
১৪. *এশিয়াটিকজার্নাল*, আগস্ট ১৮১৬, পৃ. ২০৫-২০৬
১৫. রায়, দুর্গাচরণ, দেবগনের মর্তে আগমন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৮৮৯, পৃ. ২৫৫-২৫৬
১৬. The Statesman, 1930, 18th January
১৭. *Ibid.*